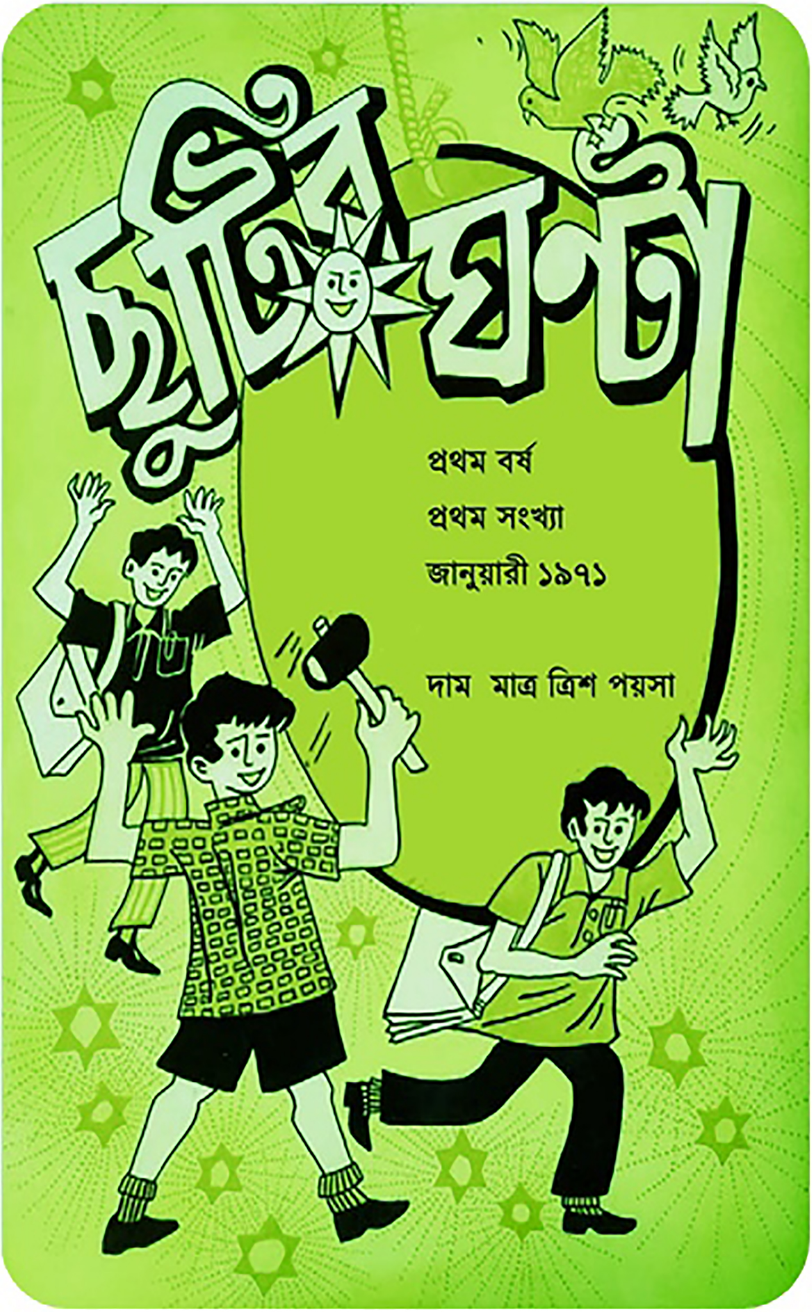

ছুটির ঘণ্টা
প্রথম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারী ১৯৭১
দাম মাত্র ত্রিশ পয়সা



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ অর্চন চক্রবর্তী

স্ক্যান ঃ অভিজিত ব্যানার্জী

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



বাপরে—এ ক্ষুদেটা কী দস্যি দামাল রে !
থেকে থেকে ওঠে রব—সামাল সামাল রে !
যাই পায় তাই খায় এমনি সে বিচ্ছু
এক ছড়া কলা পেলে চায় না সে কিচ্ছু।
ইন্দ্রজিৎ সিংহ।

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র 'ছুটির ঘণ্টা' আত্মপ্রকাশ করল।

ছোটদের জন্যে বাজারে পত্রিকার অভাব নেই; সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে আবার-নতুন করে সে চেষ্টা কেন? বিশেষ করে এই মন্দার বাজারে?

এর উত্তরে আমাদের কথা হল, 'ছুটির ঘণ্টা' আর পাঁচটা শিশু বা কিশোর পত্রিকা থেকে একটু ভিন্ন। এ পত্রিকা ছেলে-ভোলানো পত্রিকা নয়। কিশোরদের জন্যে এ পত্রিকা,—তারা সত্যি যা চায় বা যা তাদের পড়া উচিত, যা পড়লে তাদের কিশোর-মনের বিকাশ সম্ভব হয় এমন ধরনের লেখাই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

আর, বাজার যে মন্দা তাতে আর সন্দেহ কী? সেইজন্যেই তো দাম করা হল প্রতি সংখ্যা মাত্র ত্রিশ পয়সা,—আর বার্ষিক তিন টাকা পঞ্চাশ!

যাদের জন্যে এ প্রচেষ্টা তারা এবং তাদের অভিভাবকরা খুশি হলেই আমাদের শ্রম সার্থক।

ছুটির ঘণ্টা

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছুটির ঘণ্টা বাজলে মনটা সত্যি ভরে আনন্দে,
নিমেষে ছোটে সে সুনীল আকাশে মন্দ-মধুর ছন্দে।
দেখে সে নভের শুভ্র বলাকা
কেমনে মেলিছে চঞ্চল পাখা
কেমনে ফুটিছে জীবন-কুসুম প্রাণের মদির গন্ধে!

চায় না যে কেউ নিত্য কাজের নিগড়ে থাকিতে বন্দী,
বলে সে কেবল ছুটি দাও ভাই, অন্য কিছুতে মন দি।
নিয়মেরে ঘিরে আছে যে রাজ্য
কত আর তারে করি গো গ্রাহ্য,
মুক্তি কোথায় মেলে তাই বলো, তারি সাথে করি সন্ধি।

ছুটির দিনের অবাধ আকাশ সত্যই যেন দীপ্ত,
আর-আর দিনের চেয়ে তা মনকে করে গো অনেক তৃপ্ত।
দুর্গত চিতে দেয় সে শক্তি,
কর্মে আনে সে নবানুরক্তি,
জীবনে সে করে নিত্য নূতন প্রাণরসে অভিষিক্ত।

তাই বলি ওগো ছুটির ঘণ্টা বাজো তুমি ঢং ঢং,
মাখি গায়ে মোরা শ্যামল কিশোর তোমার সবুজ রং।
নির্বাধ তব গতির ছন্দ
ঘুচাক মিথ্যা ক্ষতির দ্বন্দ্ব,
কালিঞ্জরের পিঞ্জর ভেঙে চলুক কালিম্পং!



শিবরাম চক্রবর্তী

'আপনার একটু অবিমৃষ্যকারিতা হয়েছে,' বললাম আমি হর্ষবর্ধনকে : 'মানে, ঐভাবে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। ঐ লোকটা আসলে এক ডিটেকটিভ। আপনার টাকাকড়ির খোঁজখবর নিতেই এসেছিল।'

'তাতে ওর লাভ? ওকে কি আমার টাকাকড়ির ভাগ দিতে হবে নাকি?'

'গভর্মেন্ট থেকে ওকে লাগিয়ে থাকবে ইনকাম্ ট্যাকস্-এর পক্ষ থেকেও হতে পারে। মুনাফাবাজদের পাকড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না আজকাল? আপনি আবার ফলাও করে নিজের মুনাফার কথা জাহির করলেন ওর কাছে, —এক কথায়, moon offer করলেন, হাতে চাঁদ তুলে দিলেন ওর।'

'কিন্তু আপনি এটাকে অবিমিশ্রকারিতা বলছেন কেন বলুন তো?' তস্য ভ্রাতা গোবর্ধন বসে ছিল পাশেই, খট্ করে বলে বসল।

'ওকথা তো বলিনি! বলেছি অবিমৃষ্যকারিতা।' আমি ওকে শুধরে দিতে চাই।

'একই কথা। কিন্তু ওর মানেটা কি, তাই আমি জানতে চাইছি।'

'মানেটা যে কী, তা আমিও ঠিক জানিনে ভাই। অভিধানে আছে। তবে মনে হচ্ছে তোমার কথাটাতেও ওর মানে পাওয়া যায়। কী মেশাতে গিয়ে কী মেশানো—একথার সঙ্গে সেকথা মিশিয়ে কি বলতে গিয়ে কী বলে ফেলা আর কি!'

'গোয়েন্দা যে লোকটা, তা আপনি জানলেন কী করে?' জিজ্ঞেস করলেন হর্ষবর্ধন।

'চিনি যে ওঁকে। কক্কেকাশি ওঁর নাম, নামজাদা গোয়েন্দা উনি। অনেকদিন আগে ওঁর সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল আমার—কোন এক সূত্রে, উনি আমাকে চিনতে পারেন্ নি। আমি কিন্তু ঠিক চিনেছি।'

'ডিটেকটিভ কক্কেকাশি?' গোবরা জিজ্ঞেস করে। 'হুকোকাশি তো জানি মনোরঞ্জন ভটচাযের ডিটেকটিভ বইয়ে পড়েছি। ডিটেকটিভ হুকো কাশি।'

'তস্য ভ্রাতা হবেন হয়ত। জানিনে ঠিক। হুকোকাশির ভাই কক্কেকাশি হওয়া বিচিত্র নয়।' আমি জানাই।

'আমাদের কাছে ওঁকে কল্কে পেতে হবে না!' বললেন হর্ষবর্ধন

'আমাদের ল্যাজে পা দিতে এলে ওঁর কাশি প্রাপ্তি ঘটিয়ে দেব আমরা এখানে আর কল্কে পেতে হবে না!'

গোবর্ধন সায় দেয় দাদার কথায়।

২

হয়েছিল কি, ডিটেকটিভ কক্কেকাশি নিরীহ ভদ্রলোকের মতই এসেছিলেন হর্ষবর্ধনের কাছে এমনি আলাপ করতে। কথায় কথায় তিনি বললেন—'আপনাদের ব্যবসায় আর এমন কী লাভ হয় মশাই! সামান্য কাঠের কারবার তো আপনার!'

হর্ষবর্ধনের পেটের খবর টেনে বের করার জন্যই যে কথাটা ওঁর পাড়া, পাড়তেই আমি তা টের পাই।

'সামান্য!' কথাটায় ওঁর অহমিকায় লাগল। গর্বে তিনি ফেটে পড়লেন তক্ষুনি, বড়াই করে বললেন—'বলেন কী মশাই! আমাদের কারবারে কত পারসেন্ট মুনাফা আঁচ করতে পারেন তার? চার টাকার কাঠ থেকে আমরা চারশো টাকা লাভ করি তা জানেন? হিসেব করে বলুন তো কত পারসেন্ট লাভ হয় তাহলে?'

শুনে তো আমি থ হয়ে যাই, মানসাঙ্ক কষেও ওর পারসেন্টেজের কোন থই পাইনে।

'কিরকম, কিরকম?' নির্দোষ কৌতূহল দেখা যায় কল্কেকাশির। হর্ষবর্ধনের হাঁড়ির খবর জানার মতলব তাঁর, বেশ আমি বুঝতে পারি।

কিন্তু আমি ওঁকে সামলাবার আগেই উনি নিজের হাঁড়ি নিজেই হাটে ভেঙেছেন:

'কী রকম শুনবেন? শুনুন তাহলে। ছোটনাগপুরের জঙ্গল আমরা ইজারা নিই। জঙ্গলকে জঙ্গল সটান চলে গেছে সেই মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য অব্দি। অফুরন্ত জঙ্গল—সীমা পরিসীমা নেই। এন্তার গাছ। সেইসব গাছ কেটে তার ডালপালা ছেঁটে কলকাতায় আমদানি করি আমরা। এখানে আমাদের কারখানায় সেইসব ইলাহি কাঠ করাত দিয়ে চিরে তক্তা বানানো হয়—সেই তক্তা আমরা বেচি। বেচে লাভ হয় আমাদের।'

'কেমনধারা লাভ?' কল্কেকাশির কৌতূহল।

'তার কি ইয়ত্তা আছে নাকি? জঙ্গলকে জঙ্গল ইজারা নিই, বললুম না! নীলাম ডেকে ইজারা নেয়া হয়। গাছ-প্রতি আমাদের পড়তা পড়ে চার টাকার মতন, সেই চার টাকার গাছের তক্তা বেচে পাই অন্তত চারশো টাকা। তারপর'......বলে তিনি একটু থামেন, দম নিতেই বোধহয়।

'তারপর?' কল্কেকাশি উসকে দেন ওঁকে—নতুন উদ্যম দেবার জন্যই বোধহয়।

দম পেয়ে তিনি শুরু করেন আবার—'তারপর ঐ সব তক্তার থেকে যদি আমরা আলনা, আলমারি, দেরাজ, ডেস্ক্, টেবিল, চেয়ার, খাট, পালঙ্ক ইত্যাদি নানান আসবাবপত্তর বানিয়ে বেচি, তাহলে গোড়াকার সেই চার টাকাই মুনাফা হয়ে দাঁড়াবে চার হাজার টাকা। বুঝলেন?'

'না না, এর মধ্যে শ্রমের প্রশ্নও রয়েছে যে! লেবারটাও ধরতে হবে। এইসব বানাতে কারিগরদের মজুরি দিতে হয় না? তাদের চার্জও তো চারগুণ এখন। মুনাফার সবটাই আপনার নেবার নয়।' দেবার দিকটাও রয়েছে আবার।' ওঁর কথার বিপক্ষে বলে ওঁর পক্ষ সমর্থনের প্রয়াস আমার।

'তা আছে।' মেনে নেন হর্ষবর্ধন: 'হ্যাঁ, তা আছে বইকি। সেটাও ধর্তব্য ঐ সঙ্গে। তবে তা ধরেও......'

—'বিস্তর মুনাফা হয়, তাই না?' কল্কেকাশি ওঁকে দম দেন আবার।

'তা তো হয়ই। না হয়ে কি আর যায় মশাই? যাবার জো কী!'

'অ্যাতো টাকা আপনি রাখেন কোথায়!' আনাড়ির মতই জিজ্ঞাসা কল্কেকাশির।

'টাকা কি আবার রাখা যায় নাকি? রাখতে পারে কখনো কেউ? আপনার থেকেই তো উড়ে যায় টাকা। টাকার দস্তুর।'



'কেমন করে যায় কে জানে!' গোবরার সায় দেওয়া: 'আসতে না আসতে চলে যায়!'

'কী করেন অ্যাতো টাকা নিয়ে?' শুধান উনি—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কথাই।

'বিলিয়ে দিই। কী আবার করি!' হর্ষবর্ধনের সরল জবাব। 'টাকা নিয়ে কী করে মানুষ?'

বিলিয়ে, দেন!' অবাক হন কল্কেকাশি। তাঁর বিশ্বাস হয় না বলাই বাহুল্য।

'বিল মেটাতেই চলে যায় টাকা। বেতনের বিল, বোনাসের বিল।' বললেন হর্ষবর্ধন: 'আমার কারখানার মজুর কারিগরকে মাইনে দিতেই কি কম টাকাটা যায় মশাই? বেতন মিটিয়ে বোনাস দিয়ে কী আর থাকে বলুন!'

'কতো আর দেন বোনাস! বড়জোর তিনমাসের?'

'তা তো দিইই। সব কোম্পানিই তা দেয়। তবে, তারা দেয় বছরে তিন মাসের, আর আমি দিই প্রতি মাসে।'

'তার মানে?'

'মানে, মাস-মাস তিন মাসের বেতন বাড়তি দিয়ে যাই। না দিলে চলবে কেন ওদের? জিনিসপত্রের দাম তিনগুণ করে কি বেড়ে যায়নি, বলুন?'

'বলেন কী মশাই?' এবার কল্কেকাশি সত্যিই হতবাক হন।

'বলে, দাদার ঐ বোনাস পেয়ে পেয়ে আমাদের কারিগররা বোনাই পেয়ে গেল সবাই!' গোবর্ধন জানায়।

'বোনাই পেয়ে গেল? সে আবার কী?' কল্কেকাশি কথাটার কোন মানে খুঁজে পান না—'বোনাস থেকে বোনাই?'

'পাবে না? ব্যাসিলাস-এর বেলা যেমন ব্যাসিলাই। ইংরিজি কি একদম জানিনে নাকি? বোনাস-এর বহুবচনে কী হয়? জিনিয়াসের প্লুরালে যেমন জিনিয়াই, তেমনি বোনাস-এর প্লুরালে তো বোনাই-ই হবে। হবে না?'

গোবর্ধন আমার দিকে তাকায়।

'বোনাস-এর ওপর বোনাস পেতেই ওদের আইবুড়ো বোনেদের বিয়ে হয়ে গেল যত। আপনিই বররা এসে জুটে গেল সব। বিনা পণেই বলতে কী। বউয়ের হাত দিয়ে সেই বোনাস-এর ভাগ বসাতেই বোনাইরা জুটে গেল সব আপনার থেকেই।'

'এই কথা!' কথাটা পরিষ্কার হওয়ায় কল্কেকাশি হাঁফ ছাড়লেন: 'তাহলেও বাড়তি টাকার অনেকখানি মজুদ থেকে যায়—সে সব টাকা

রাখেন কোথায়? ব্যাঙ্কে, না বাড়িতে? তিল তিল করে জমলেও তো তা তাল হয়ে ওঠে একদিন—আপনাদের সেই বিপুল ঐশ্বর্য……'

'অরণ্যেই ওঁদের ঐশ্বর্য।' কথাটা আমি ঘুরিয়ে দিতে চাই: 'ঐশ্বর্য কি আর ওঁদের বাড়িতে আছে? না, বাড়িতে থাকে? জমিয়ে রাখবার দরকারটাই বা কী? গোটা অরণ্যভূমিই তো ঐশ্বর্য ওঁদের। বনস্পতি-রূপে জমানো। কাটা গাছই টাকার গাছ।' বলে উদাহরণ দিয়ে কথাটা আরো পরিষ্কার করি: 'যেমন মরা মরা জপতে জপতেই রাম হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি কাটা উল্টোলেই টাকা হয়ে যায় মশাই! মানে কাটা গাছই উল্টে টাকা দেয় কিনা! টাকার গাছ তখন।'

'বুঝেছি।' বলে ঘাড় নেড়ে কঙ্কেকাশি চাড় দেখান—'আবার আপনাদের বাড়ি সেই গৌহাটি না কোথায় যেন বললেন না? আসাম থেকেই তো আসা আপনাদের এখানে—তাই নয়? তা আসামের বেশির ভাগই তো অরণ্য। তাই নয় কি? তাহলে বোধহয় সেই অরণ্যের কাছাকাছি কোথাও ……মানে আপনাদের বাড়ির কাছেই হয়ত কোন গভীর জঙ্গল আছে, তাই না?'

কঙ্কেকাশির কথায় হর্ষবর্ধনের কোন সাড়া পাওয়া যায় না আর। তিনি শুধু বললেন—'হুম!' বলেই কেমনধারা গুম হয়ে যান। কঙ্কেকাশির উদ্যম সত্ত্বেও তাঁর গাম্ভীর্যের বাঁধ ভেঙে কথার স্রোত আর এগুতে পারে না।

'আচ্ছা, নমস্কার, আজ আসি তাহলে।' বলে উঠে পড়েন—'আপনার নাম শুনেছিলাম, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দ হল। নমস্কার।'

'লোকটার কথাবার্তা কেমনধারা যেন!' কঙ্কেকাশি গেলে পর মুখ খুললেন হর্ষবর্ধন, 'আমাদের টাকাকড়ির খোঁজখবর পেতে চায় লোকটা!'

'হ্যাঁ দাদা, কেমন যেন রহস্যময়!' গোবরা বলে।

তখন আমি ভদ্রলোকের রহস্য ফাঁস করে দিই। জানাই যে ঐ কঙ্কে-কাশি কোন কেউ-কেটা লোক নন, এক ধুরন্ধর গোয়েন্দা। সরকার এখন কালোবাজার-এর টাকার সন্ধানে আছে কিনা, কোথায় কে কালো টাকা কালো সোনা জমিয়ে রেখেছে……

'কালো সোনা তো আফিঙকেই বলে মশাই। সোনার দাম এখন আফিঙের।' দাদার টীকা—আমার কথার ওপর—'আমার কি আফিংএর চাষ নাকি ?'

'আবার কেষ্ঠঠাকুরকেও বলে থাকে কেউ-কেউ।' তস্য ভ্রাতার টিপ্-পনি দাদার ওপরে।

'এখনকার দিনে কালো টাকা তো কেউ আর বার করে না বাজারে, সোনার বার বানিয়ে লুকিয়ে কোনখানে মজুদ করে রাখে, বুঝেছেন ?' আমি বিশদ ব্যাখ্যা করি তখন—'আপনারা কালো বাজারে—মানে, কাঠের কালোবাজার করে প্রচুর টাকা জমিয়েছেন সরকার বাহাদুরের সন্দেহ। তাই তার আঁচ পাবার জন্যই এই গোয়েন্দা প্রভুটিকে লাগিয়েছেন আপনার পেছনে।'

'তাহলে তো বেশ গনগনে আঁচ মশাই মানুষটার!' গোবর্ধন বলে, 'না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই—বাঁচা নেই আমাদের!'

'সর্বনাশ করেছেন দাদা!' হর্ষবর্ধনের প্রায় কাঁদার উপক্রম, 'আপনি ঐ লোকটাকে আসামের অরণ্য দেখিয়ে দিয়েছেন আবার!'

এমন সময় টেবিলের ফোন ক্রিং ক্রিং করে উঠল ওঁর। ধরলেন হর্ষ-বর্ধন—'হ্যালো! কে ?···কে একজন ডাকছেন আপনাকে।' রিসিভারটা এগিয়ে দিলেন উনি।

'আমাকে! আমাকে কে ডাকতে যাবে এখানে ?' অবাক হয়ে আমি কর্ণপাত করলাম—'হ্যালো, আমি শিব্রাম······আপনি কে ?'

'আমি কঙ্কেকাশি। কাছাকাছি এক ডাক্তারখানা থেকে ফোন করছি আপনাকে। ওখানে বসে থাকতে দেখেই আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি বোধহয় পারেন নি আমায়······শুনুন, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা পেলুম আপনার। আজ রাত্রের ট্রেনে আমি গৌহাটি যাচ্ছি। আসুন না আমার সঙ্গে! প্রকৃতির লীলাভূমি আসাম, আপনি লেখক মানুষ, বেশ ভালো লাগবে আপনার। দু-পাঁচ দিন অরণ্য বিহার করে আসবেন এখন। কেমন, আসছেন তো ?'

'অরণ্য বিহার ?' আমি সাড়া দিই: 'আজ্ঞে না। আমাদের বাড়ি

ঘাটশিলায়, তার চারধারেই জঙ্গল পাহাড়। প্রায়ই সেখানে যাই আমি—সঠিক বললে, বিহারের বেশির ভাগই অরণ্য। খোদ বিহার অরণ্যে বাস করি। আমাকে আবার গৌহাটি গিয়ে অরণ্য বিহার করতে হবে কেন? অরণ্য দেখে দেখে অরুচি ধরে গেছে আমার। আর সত্যি বলতে, এক আধটু লিখি-টিখি বটে তবে কোন প্রকৃতি-রসিক আমি আদপেই নই।'

ফোন রেখে দিয়ে হর্ষবর্ধনকে বললাম—'ঐ ভদ্রলোক—মানে কক্কোশিই ফোন করেছিলেন। এখন আজ রাত্রের ট্রেনে উনি গৌহাটি যাচ্ছেন…'

'অ্যাঁ? গৌহাটি যাচ্ছেন? কী বললেন? অ্যাঁ?' আতঙ্কিত হন হর্ষবর্ধন, 'সেরেছে তাহলে! এবার আমাদের সর্বনাশ রে গোবরা!'

'সর্বনাশ কিসের? বাঁচিয়ে দিয়েছি তো আপনাকে। এখানে আপনাদের বাড়িতে তল্লাসি করলে বিস্তর সোনা দানা পেয়ে যেত, এখান থেকে কায়দা করে কেমন হটিয়ে দিলাম! এখন মরুক না গিয়ে আসামের জঙ্গলে! অরণ্যে রোদন করে বেড়াক!'

'এখানে আমাদের বাড়ি তল্লাসি করে কিছুই পেত না সে। বড় জোর লাখ-খানেক কি দেড়েক—আমাদের দৈনন্দিন দরকার মিটিয়ে মাস খরচের জন্যে লাগে যেটা। আমরা কি এখানে টাকা জমাই নাকি মশাই? চোর ডাকাতের ভয় নেইকো? সেদিনের কারখানার সেই চুরিটা হয়ে যাবার পর থেকে আমরা সাবধান হয়েছি। আমাদের কারবারের লাভের টাকার আর বাড়তি যা কিছু সব আমরা সোনার বাট বানিয়ে গৌহাটি নিয়ে যাই—বাড়ির কাছাকাছি একটা জঙ্গলে গিয়ে এক চেনা গাছের তলায় পুঁতে রেখে আসি।'

'চেনা গাছ!' অবাক লাগে আমার, 'গাছ কি কখনো আবার চেনা যায় নাকি? একটা গাছের থেকে আরেকটাকে, এক গোরুর থেকে অন্য গোরু, এক চিনেম্যানের থেকে আরেক চিনেম্যান কি আলাদা করে চিনতে পারে কেউ? গাছ যদি হারিয়ে যায়?'

'ঐ একটা জিনিস যা কখনো হারায় না, টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় না কদাচ। হাত পা নেই তো, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়…'

'এইজন্যেই তো শুদ্ধ ভাষায় ওদের পাদপ বলেছে, তাই না দাদা?'

গোবিরার সটীক ভাষ্য, 'বনে আগুন লাগলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, কিন্তু সেখানে থেকে মোটেই জ্বালাতে পারে না।'

'আমি তো মশাই চিনতে পারিনে, শাখা প্রশাখা ডাল পালা নিয়ে সব গাছই তো আমার চোখে এক চেহারার মনে হয়। ফুল ধরলে কি ফল ফললে তখন যা একটু টের পাই তাদের সাতগোত্রের—কোন্‌টা আম কোন্‌টা জাম—কিন্তু কোন্ গাছটা যে কোনজনা তা আমি চিনে রাখতে পারিনে।'

'আমরা পারি। একবার যাকে—যে গাছটাকে দেখি তাকে সারা জীবনে ভুলিনে…'

'যাকগে সেকথা…এখন আপনাদের গোয়েন্দা যদি আমাদের বাড়ি গিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের যতো গাছের গোড়ায় গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি লাগিয়ে দেয় তাহলেই তো হয়েছে!'

'গোড়ায় গলদ বেরিয়ে পড়বে আমাদের!' গোবরা বলে।

'একটা না একটার তলায় পেয়ে যাবে আমাদের ঐশ্বর্যের হদিশ। অরণ্যেই আমাদের ঐশ্বর্য; যতই গালভরা হোক, কথাটা বলে আপনি ভালো করেননি। হদিশ দেওয়া ঠিক হয়নি আপনার।'

'তার চেয়ে আপনি কষে আমাদের গাল দিতে পারতেন বরং। কিছু আসত যেত না। গালে চড় মারতেও পারতেন।' গাল বাড়িয়ে দেয় গোবরা।

'কী করা যায় এখন!' মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন হর্ষবর্ধন। বসে তো ছিলেনই, মনে হয়, আরো যেন তিনি বসে গেলেন।

'চলো দাদা, আমরাও গৌহাটি চলে যাই', গোবরা একটা পথ বাতলায়: 'ওই ট্রেনেই চলে যাই আজ। গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি করা যাক বরং। ডিটেকটিভ বই তো কম পড়িনি—ওদের হাড়-হদ্দ জানি সব। কিছুই আমার অজানা নয়।'

ওর পড়া-শোনার পরিধি কদ্দুর জানার আমার কৌতূহল হয়। সে অকাতরে বলে—'কম বই পড়েছি নাকি? লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে আনিয়ে কিছু পড়তে আর বাকি রাখিনি। সেই সেকেলে 'দারোগার দপ্তর' থেকে শুরু করে পাঁচকড়ি দে—আহা, সেই মায়াবী মনোরমা বিষম বৈসূচন…কোনটাই বাদ নেই আমার। সেই নীলবসনা সুন্দরী!' [চলবে]

খেলা

কার্তিক মজুমদার

এই নতুন বাড়িটায় উঠে এসে বেশ ভাল লেগেছিল। যাঁরা বাড়ির মালিক তাঁরা উপর তলায় থাকেন। মালিক বলতে মাঝ-বয়সী কর্তাগিন্নি, অতি শান্ত অতি সজ্জন। তাঁরা নিঃসন্তান, সুতরাং বিশাল বাড়িটা দারুণ-ভাবে শান্ত। আর্থিক প্রয়োজনে ভাড়াটের দরকার তাঁদের ছিল না, শুধু ফাঁকা বাড়িটা ভরাট করার জন্যই একতলাটাতে আমাকে ভাড়াটে হতে দিয়েছিলেন। এত বড় একটা বাড়িতে এক নিঃসঙ্গ দম্পতি কেমনভাবে একলা থাকতেন সে কথা ভেবে আমার অবাক লেগেছিল। সকালে বিকেলে দেখতাম দুজনে ধীরে ধীরে ওপাশের দরজা দিয়ে বেড়াতে চলেছেন। কর্তার চোখে খুব বেশি পাওয়ারের চশমা, হাতের লাঠিটা খুব হালকাভাবে মাটিতে ছুঁইয়ে হাঁটছেন, স্ত্রীও চলছেন খুব ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে। সকালের দিকে তাঁরা যান লেকের জলার ধারে ঘুরতে, ফেরেন ঘণ্টাদুয়েক বাদে, যখন আমি সকালের দাড়ি কামাই। বিকেলের দিকে যান মিশন হলে, সে জায়গা থেকে কখন আসেন টের পাই না। তাঁরা যদিও খুব ভদ্র, কিন্তু মিশুক বলে মনে হয় না। আসার প্রথম দিন আমার দেখাশুনো যথেষ্ট করেছিলেন, চা করে খাইয়েছিলেন। মুখোমুখি হলে হাসিমুখে দু-একটা কুশল প্রশ্নও করেন। এতে আমি সুখেই ছিলাম, কারণ আমারও এমনি স্বভাব যে নির্জন থাকতেই ভালবাসি। ফলে এক বাড়িতে থাকলেও আমাদের মধ্যে একটা ভাল ব্যবধান ছিল।

কিন্তু সে ব্যবধান ভেঙে দিল আমার চার বছরের ভাগনে টুটু। আমার মাস-ছয়েক থাকার পর আমার দিদি দিল্লী যাবার পথে আমার এখানে দিন-কয়েক কাটিয়ে যাবে বলে উঠল। যেদিন এল সেদিন তার সঙ্গে গল্পে গল্পে আমি অত লক্ষ্য করিনি, কিন্তু তার পরের দিন হঠাৎ তাকিয়ে দেখলাম উপরের সিঁড়ি বেয়ে টুটু একটা কাঠের দোতলা বাস আর তুলোর তৈরি হাতি বগলে নিয়ে সন্তর্পণে সিঁড়ির ধাপ দেখে দেখে পা ফেলে নেমে আসছে। আর তাকিয়ে দেখলাম, উপরে যাবার এ পাশের দরজাটাও খোলা।

আমি চিন্তায় পড়লাম একটু। মনে হল দিদিকে বলা উচিত ছিল আগেই যে উপরে যাওয়াটা ঠিক শোভন নয়। উপরের লোকেরা বিরক্ত হতে পারেন, তাঁদের কাজকর্মের ব্যাঘাত হতে পারে। টুটুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

আমার বিস্ময় টুটুর লক্ষ্য করার কথা নয়। সে একগাল হেসে বলল, 'খেলতে।' ওর মুখচোখ বেশ খুশিতে লাল। বুঝলাম, একতলার বদ্ধ ঘরের চেয়ে উপরের আলো হাওয়ার মধ্যে ও আনন্দ পেয়েছে।

দিদি এমন সময় ঘরে ঢুকল, রাঁধছিল বোধহয়। হাতদুটো মুছতে মুছতে হেসে বলল, 'এখানে আসবার দিন থেকেই টুটু উপরে গিয়ে খেলা শুরু করেছে। ওর বগলে ঐ যে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছিস, ওটা ওর রাত্তিরে ঘুমোবার সময় পর্যন্ত ওটা জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়।'

'ওপরে ও কার সঙ্গে খেলে?'

'কার সঙ্গে আবার? হয় বুড়োবুড়ির সঙ্গে, নয় তো ঝি-টা আসে তার ছেলেপুলের সঙ্গে হয়ত। নয় তো একাই খেলে। ওদের তো খেলার হাঙ্গামা নেই!' দিদি টুটুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখি তোমার হাত? চল ধুয়ে দি, কত ময়লা!'

এর পরে রোজই দেখতে পেতাম সকালে দুধ খাবার পর টুটু তার সম্পত্তি বগলদাবা করে গুটি-গুটি থপ-থপ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে অন্তর্ধান করে। আমি কাজে বেরিয়ে যাই, কখন ফেরে জানি না। বুড়োবুড়ির বোধহয় ভাল লেগেছে খালি বাড়িতে একটা ছোট ছেলেকে পেয়ে। তা না হলে টুটু এত মহোল্লাসে ওখানে যাবে কেন?

দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম একদিন, 'উপরের লোকদের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'

দিদি হাসল। বলল, 'না, টুটুর সঙ্গেই তাদের আলাপ। তবে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলে ওঁরা হাসেন, এই অবধি।'

সেদিন টুটু যখন খেলে ফিরছে, তখন তার সঙ্গে দেখা হল। বললাম, 'খেলা হল খুব?'

ও সহাস্যে ঘাড় নাড়ল।

'কী খেলা হয় উপরে গিয়ে ?'

টুটু বলল, 'ভাল খেলা হয়।'

বললাম, 'ভাল খেলা কী খেলা ? গাড়ি নিয়ে খেলা ?'

ও ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বোঝাল।

'আর কি, পুতুল নিয়ে খেলা ?'

এতেও ও সহাস্যে সায় দিল, আর আমার জামা ঘেঁষে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন আরও প্রশ্ন করলে ও খুশি হয়।

তাই আরও প্রশ্ন করলাম, 'কার সঙ্গে খেলা কর উপরে ?'

টুটু বলল, 'বাবলুদাদার সঙ্গে।'

'দাদুর সঙ্গে খেল না ?'

'হ্যাঁ, দাদুর সঙ্গে।'

'বাবলুদাদা মারে না খেলার সময় ?'

টুটু ঘাড় নাড়ল। বলল, 'না, আমার সঙ্গে খেলে।'

বুঝলাম, উপরের ঝির ছেলে-টেলের সঙ্গে ও বেশ খেলায় মেতে আছে। ওর নাকটা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বললাম, 'যাও, মা তোমায় খেতে দেবে।'

এর দিন-তিনেক পরে রবিবার দিনের সকালবেলায় আমি লক্ষ্য করলাম উপরের বুড়ো ভদ্রলোক একা বেড়াতে বের হলেন। ভাবলাম স্ত্রীর হয়ত শরীর খারাপ। তারপর চা খাওয়া শেষ করে বের হতে যাব, এমন সময় উপরের চাকরটা এসে আমাকে বলল, 'আপনাকে বাবু একটু ডেকেছেন, যদি সময় পান।'

সেদিন বাড়ি ভাড়া দেবার কথা নয়, কারণ মাসের মাঝামাঝি। মনে হল টুটুবাবু হয়ত উপরে গিয়ে কোন উপদ্রব শুরু করে থাকবেন। আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে রওনা হলাম। ভদ্রলোক আমার জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন, সাদরে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

টুটুর কোন কথা উঠল না। এ-কথা সে-কথা চলতে লাগল। চা খাওয়া শেষ হল। চামড়ার কেস থেকে চুরুট বের করে ভদ্রলোক ধরালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'টুটু আপনার ভাগ্নে ?'

আমি শঙ্কিত হলাম, 'হ্যাঁ, কদিনের জন্য ওরা এসেছে।' তারপর একটু হেসে বললাম, 'উপরে আপনাদের খুব বিরক্ত করছে?'

ভেবেছিলাম ভদ্রলোক ভদ্রতাবোধে তাড়াতাড়ি না-না করে উঠবেন। এইসব ক্ষেত্রে সবাই সেইরকম করে। কিন্তু তিনি অস্বাভাবিক স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে রাখলেন।

আমি বিস্মিতের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বললেন, 'টুটুকে আমাদের খুবই ভাল লাগে। ও যেদিন পুতুল বগলে করে উপরে এসে হাজির হল সেদিন থেকেই। আমরা দুজন নিঃসঙ্গ থাকি, ছেলেপুলে নেই, বুঝতেই পারেন একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখলে আমাদের কত আনন্দ হয়। ওকে দেখে তো আমরা স্বর্গ পেয়েছিলাম। শান্ত, হাসিখুশি, ভোলানাথ, ভয় নেই, দুঃখ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম।'

ভদ্রলোক একটু নিশ্বাস নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'উপরে এসে টুটু প্রথমে আমার সঙ্গে খেলত। আমরা যখন ব্যস্ত থাকতাম, তখন আপন মনে একা-একাই খেলত। পাশের ঘরে একা একা খেলতে ওর কোন অসুবিধে নেই। চার বছরের বাচ্চা ছেলে, পুতুলের সঙ্গেই কথা বলে। বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে কতদিন শুনেছি ও আপন মনে খালি ঘরে পুতুলের সঙ্গে কথা বলছে। আমি ও আমার স্ত্রী শুনতে শুনতে হাসতাম। কিন্তু সেদিন ব্যাপারটা দেখলাম অন্যরকম।'

'অন্য রকম, মানে?'

'হ্যাঁ, একেবারে অন্য ধরনের। টুটু কি করছে দেখবার জন্য আমি কাগজ পড়া শেষ করে পাশের ঘরের জানলায় একটু উঁকি মারলাম। হঠাৎ আমার কি একটা খটকা লাগল। চুপ করে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, টুটু খেলছে আর মাঝে-মাঝে খিলখিল করে হাসছে। আর, খেলছে কিন্তু একা নয়। আর কারো সঙ্গে। কিন্তু কার সঙ্গে? ঘরে তো দ্বিতীয় কেউ নেই! অথচ অন্য একজনের সঙ্গে সে জমিয়ে খেলছে, কাঠের বাসটা ধরে টানাটানি করছে, তার হাত ধরে টানছে, তার হাত থেকে

পুতুল নিচ্ছে, তার সঙ্গে কথা বলছে, তার সঙ্গে রাগ করছে, ভাব করছে, তার সঙ্গে আনন্দে হেসে উঠছে। আমি স্তম্ভিতের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই শিশুর বিচিত্র খেলা দেখতে লাগলাম। একজনকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আর একজন ছায়া হয়ে ছিল।

'আমার স্ত্রীও কোন সময় এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন লক্ষ্য করিনি। যখন লক্ষ্য করলাম, তখন তাঁর চোখে-মুখেও আমার মত বিস্ময়। সাদা ফ্যাকাশে মুখে তিনি দেখছেন টুটু তার সঙ্গীকে তাদের বাড়ি যাবার জন্য সাধাসাধি করছে। তা দেখে আমার স্ত্রী সামলাতে পারলেন না, কেঁদে ফেললেন।

'সেদিনকার মত খেলা সেখানেই শেষ হল। টুটু তার খেলার সম্পত্তি নিয়ে হাসিমুখে নিচে রওনা হল। আমাদের মুখের হাসি মুখেই মুছে গেল। তার পর থেকে রোজ বসে থাকি টুটুর প্রতীক্ষায়। সে আসে, কখনো ঐ ঘরে, কখনো চিলেকোঠার ঘরে; কখনো পুতুল নিয়ে খেলা করে, কখনো কাগজ নিয়ে ঘুড়ি বানায় তার সঙ্গীর সঙ্গে। আর আমরা দুজনে আকুল হয়ে চেয়ে থাকি। যদি টুটুর মত দৃষ্টি পাই,—যদি তার সঙ্গীকে এক ঝলকের জন্যও দেখতে পাই!'

ভদ্রলোক থামলেন। চেয়ে দেখলাম, তাঁর চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট। আমি একটু দ্বিধা করে বললাম, 'আপনারা ঠিক দেখেছেন তো? মানে চোখের ভুল নয় তো?'

ভদ্রলোক ম্লান হাসলেন, 'তাই যদি বলেন, তবে আমাদের দুজনেরই চোখের ভুল হচ্ছে, আর তা রোজই হচ্ছে। সেটা কি খুব স্বাভাবিক?'

আমি অপ্রস্তুত হলাম, বললাম, 'আমি জানতাম ও উপরতলায় গিয়ে বাবলু বলে একজনের সঙ্গে খেলা করে। টুটুই আমাকে বলেছিল।'

ভদ্রলোকের চোখ চিকচিক করে উঠল। তাঁর গলায় আবেগের আভাস পেলাম। বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, বাবলুর সঙ্গেই ও খেলা করে।'

তাঁর কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, 'বাবলু—বাবলু তাহলে কে?'

'বাবলু আমাদের ছেলে', উনি নিশ্বাস ফেলে অন্য দিকে তাকিয়ে

বললেন 'বহুদিন হল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।' বলতে বলতে ঘরের ক কোণে একটা ছবির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম, ৬দিনের পুরোনো একটা ফোটো। টুটুর চেয়ে সামান্য বড় একটি শিশুর ৮া৺ ছবি।

আমাদের বাড়িতে অন্য কোন ছেলের আসা যাওয়া নেই।' ভদ্রলোক ।পন মনেই বলে উঠলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম আমরা দুজনে। কেউই কোন কথা লতে পারলাম না। আমার মন অবিশ্বাস করছে, আর তাঁর মন প্রত্যক্ষের ।নায় গিয়ে বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে থমকে আছে। অনেকক্ষণ আমরা বনে নিঃশব্দে বোধহয় দুজনের মন নিয়ে পরস্পর চিন্তা করছিলাম।

একটু বাদেই উনি উঠে বললেন, 'আপনি দেখতে চান, আসুন।'

আমরা উঠলাম। যেতে যেতে উনি বললেন, 'আজ ও-ঘরে নয়। কাকোঠার ঘরটায় ওরা খেলছে।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আমরা থমকে ড়ালাম। টুটুর উল্লাসভরা টিনটিনে গলার চিৎকার শোনা গেল: ।বলুদাদা, আর জল দিও না, বাবলুদাদা, আর মাটি লাগবে না! বাবলুদাদা, মজা!' আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এক ধুলোমাটির খেলাঘরের টনা শুনতে লাগলাম। স্তম্ভিতের মত হয়ত অনেকক্ষণ শুনছিলাম। ।রপরই আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে ভদ্রলোকের হাত ধরে দ্রুতপায়ে যেতে ।তে বললাম, 'চলুন, উপরে যাওয়া যাক।'

ফাঁকা ছাদের উপর একটি ঘর। ভিতরে ঢুকে দেখি কাদামাটির ।নারকম জিনিসপত্র সাজিয়ে টুটু ব্যস্ত। ঘরে কেউ নেই টুটু ছাড়া। ।র এক পাশে কিছু মাটি, আর এক পাশে একটা ভাঙা মগে জল। পারে কাঠের বাসটা আর পুতুলটা পড়ে আছে। আজ তাদের অন্য খেলা। ।নাদের দেখতে পেয়ে টুটু হাসিমুখে তাকাল।

বললাম, 'কী খেলছিলে এতক্ষণ?'

ও বলল, 'দোকান-দোকান খেলছিলাম।'

আমার গলা আটকে আসছিল, তবু ধীরে ধীরে বললাম, 'কার সঙ্গে ।লছিলে?'

'বাবলুদাদার সঙ্গে।' টুটু তার কাদামাখা হাতটা জামায় মুছে কাঠের বাসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'তোমার বাবলুদাদা কোথায়?' আমার গলা কেঁপে উঠল। ঘরে আর কেউ নেই, ত্রিসীমানায় কেউ নেই। স্তব্ধ শীতল ঘর।

'ও চলে গেল। আজ আর খেলব না।' টুটুর চোখের দৃষ্টিপথের দিকে তাকালাম আমরা দেখলাম, সদ্য-চলে-যাওয়া ছোট পায়ের ছাপ জলকাদায় স্পষ্ট হয়ে ঘরের মধ্য দিয়ে দরজা পার হয়ে ছাদের উপরে গিয়ে মিলিয়ে গেছে।

ছুটির ঘণ্টা

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

শীতের ছোঁয়া গাছের শাখে, শীতের ছোঁয়া জলে,
শীতের ছোঁয়া রোদ-মাখা ঐ নীরস বনতলে।
শীতের ছোঁয়া ঝিরঝিরে ঐ দিঘির ঘাটে ঘাটে,
শীতের ছোঁয়া পত্রঝরা শুকনো মাঠে মাঠে।
শীতের ছোঁয়া ধান-কাটা ঐ খেতের আলে আলে,
শীতের ছোঁয়া পৌষালির ঐ পায়েস পিঠের থালে।
শীতের কামড় বৃদ্ধ দাদুর শুকনো হাড়ে হাড়ে,
শীতের ছোঁয়া ভোরবেলার ঐ খেজুর রসের ভাঁড়ে।
আজকে যেন শীতটা ভারি, উঠছি কেঁপে কেঁপে,
শনশনিয়ে কনকনে বায় বইছে আকাশ ব্যেপে।

কখন বেলা গড়িয়ে গেল, উতল হল মনটা,
এমন সময় ঢং ঢং ঢং বাজল ছুটির ঘণ্টা।

জবানবন্দি

(রহস্য-নাটিকা)

শৈলেশ ভড়

[ঘরের মধ্যে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার সামনে গোল হয়ে বসেছে মৃত নিঃসন্তান রায়বাহাদুরের দূর সম্পর্কের দুই ভাগ্নে হিরণ এবং কিরণ, নবনিযুক্ত সেক্রেটারি জগদীশবাবু, পুরনো ক্যাশিয়ার মদনবাবু। ওদের পেছনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো চাকর মধুর, বাবুর্চি, আয়া, মালি আর দারোয়ান বীরবাহাদুর। ওদের সামনে বসে আছে বিখ্যাত ডিটেক্টিভ করঞ্জাক্ষ সেহানবিশ। বড় ভাগ্নে হিরণের হাতে পায়ে ব্যাণ্ডেজ। পঙ্গু-চেয়ারে বসে ঘুরে বেড়ায়।]

করঞ্জাক্ষ—আপনারা সকলেই জানেন, এই বাড়ির মালিক রায়বাহাদুর গতরাত্রে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গেছে যে, রাত্রি এগারোটা থেকে সোয়া এগারোটার মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সামনে থেকে বুকে ছুরি মেরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

হিরণ—উনি কি বাধা দেবার কোন চেষ্টা করেন নি ?

করঞ্জাক্ষ—করেন নি বলেই মনে হয়। তবে মৃত্যুর পর তাঁর মুখচোখের অবস্থা দেখলে মনে হয় তিনি রীতিমত বিস্মিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং আত্মরক্ষা করার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আর, ছুরির ওপর কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। মনে হয়, হত্যাকারী চামড়ার দস্তানা পরে তার কাজ হাসিল করেছে।

কিরণ—আপনার কি মনে হয় এই বাড়িরই কেউ তাঁকে হত্যা করেছে ?

করঞ্জাক্ষ—এখনি সেকথা বলা সম্ভব নয়। আমি অবশ্য অনুসন্ধানের জন্যই এখানে এসেছি। আপনারা এখন দয়া করে আমাকে বলুন রাত্রি এগারোটা থেকে সোয়া এগারোটা কে কোথায় ছিলেন। মনে রাখবেন,

আপনাদের সঠিক জবানবন্দির ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। হিরণবাবু, আপনি প্রথমে শুরু করুন।

হিরণ—ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে পড়ি মাচা থেকে। ফলে ডান হাত আর ডান পায়ের হাড়টা গেছে ভেঙে। তাই বাড়িতেই থাকতে হয় সব সময়। তবে ঐ সময় আমার যতদূর মনে পড়ে আমি নজরুলের একটি কবিতা আবৃত্তি করছিলাম। এমন সময় মথুরের চিৎকার শুনে—

করঞ্জাক্ষ—কী আবৃত্তি করছিলেন একটু শোনান না আমাদের।

[হিরণ আবৃত্তি করল, এবং সকলের অলক্ষ্যে করঞ্জাক্ষ সেটা টেপ রেকর্ড করে নিল।]

করঞ্জাক্ষ—বাঃ, ভারি সুন্দর আবৃত্তি করেন তো আপনি! বেশ, এবার সেক্রেটারি জগদীশবাবু আপনি বলুন, সে সময় কী করছিলেন এবং কোথায় ছিলেন।

জগদীশ—রাত্রি এগারোটা থেকে রায়বাহাদুর তাঁর শোবার ঘরে বসে অফিসের 'গোপনীয়' 'অতি গোপনীয়' এবং 'জরুরি' চিঠি, কাগজপত্র দেখতেন। এবং এ সময় তাঁর ঘরে যাবার কারো হুকুম ছিল না। কেবল বাড়ির পুরাতন এবং তাঁর প্রিয় চাকর মথুর একসময় গিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ রেখে আসত। দরজায় ইয়েল লক্ ছিল, এবং বেরিয়ে আসবার সময় সেটা সে লাগিয়ে দিত। তবে—

করঞ্জাক্ষ—থামলেন কেন? বলুন, কী হয়েছিল সেদিন?

জগদীশ—সেদিন সকাল থেকেই তাঁকে রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

করঞ্জাক্ষ—কারণটা জানতে পেরেছিলেন কিছু? জিজ্ঞেস করেন নি কেন?

জগদীশ—তিনি এত রাশভারি লোক ছিলেন যে নিজে না জানালে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করত না। তবে, আমি ঐ সময় আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে একটি ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়ছিলাম।

করঞ্জাক্ষ—হিরণবাবুর আবৃত্তি শুনতে পান নি?

জগদীশ—(একটু থতমত খেয়ে) হ্যাঁ, শুনেছিলাম। ভারি সুন্দর আবৃত্তি করেন তিনি।

করগ্লাক্ষ—(কিরণের দিকে) গতরাত্রে এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

কিরণ—রাত্রের শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম। ফিরতে প্রায় এগারোটা হয়েছিল। এসেই শুনি এই শোচনীয় মৃত্যুর কথা। তারপর তাঁর ঘরের সামনে ভিড়।

করগ্লাক্ষ—সিনেমায় যে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে কিছু ?

কিরণ—হ্যাঁ (পকেট হাতড়ে) এই আধখানা টিকিট তার প্রমাণ।

করগ্লাক্ষ—সাক্ষী আছে কেউ ?

কিরন—আমার চারজন বন্ধু সঙ্গে ছিল। প্রয়োজন হলে তারা সাক্ষী দেবে।

করগ্লাক্ষ—বেশ। আচ্ছা, এবার মথুর বল তোমার কথা। তুমি এ-বাড়ির সবচেয়ে পুরনো লোক এবং কর্তাবাবুর খুবই প্রিয় ছিলে বলে শুনেছি। মৃতদেহ তুমিই প্রথম দেখ, তাই না ?

মথুর—হ্যাঁ বাবু। ঐ সময় আমি বাড়িতেই ছিলাম। বাবুর দুধ গরম করছিলাম তখন। তারপর রাত্রে বাবুর ঘরে দুধ নিয়ে গিয়ে দেখি, তিনি— (মথুরের কান্না)

করগ্লাক্ষ—তখন ঠিক কটা হবে বলতে পার ?

মথুর—ঠিক সাড়ে এগারোটা—বাবুর ঘরের দেয়াল-ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল।

করগ্লাক্ষ—রায়বাহাদুরকে তুমি কী অবস্থায় দেখলে সেটা পরিষ্কার করে বল।

মথুর—দরজা ঠেলে ঘরের ঢুকেই দেখি বাবু চেয়ারে পিঠ এলিয়ে পড়ে আছেন, বুকে একটা ছোরা আমূল বসানো আর তার পাশ দিয়ে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে।

করগ্লাক্ষ—হুঁ। আচ্ছা দারোয়ান, তুমি কাউকে রাত্রে আসতে দেখেছ ?

দারোয়ান—রাত্রি এগারোটার ঘন্টা পিটিয়ে আমি যখন আমার ঘরে

এসে ঢুকলুম তখন ছোটদাদাবাবুকে বাড়ি আসতে দেখেছি। তারপর মিনিট পনের কুড়ি বাদে তিনি আবার ফিরে যান।

কিরণ—(উত্তেজিত হয়ে) মিথ্যে কথা! আমি সাড়ে এগারটার আগে আর বাড়িতেই আসিনি!

করঞ্জাক্ষ—(দারোয়ানকে) তুমি কি ঠিক ওঁকেই দেখেছিলে বীর-বাহাদুর?

দারোয়ান—মুখটা ভাল করে দেখতে পাইনি হুজুর। টুপিটা কপাল অবধি নামানো ছিল। তবে ডান পা-টা একটু ঘসড়ে হাঁটছিলেন। মাতাল হলে তিনি এমনিভাবেই চলাফেরা করে থাকেন।

করঞ্জাক্ষ—আচ্ছা, এবার চলি। যাবার সময় বীরবাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কারণ হত্যাকারীকে ও দেখেছে, এবং একথা সে জানতে পারলে ওর প্রাণসংশয় হতে পারে। ওর বদলে বাড়িটা পুলিশে পাহারা দেবে।

[আলো নিভে যাবে। একটু পরে আবার জ্বলে উঠলে দেখা যাবে কিরণবাবু নেই, আর হিরণবাবু পঙ্গু চেয়ারের চাকা ঠেলে ঘরে ঢুকছেন। তাঁর পেছনে ক্যাশিয়ার মদনবাবু। সেক্রেটারি জগদীশবাবু এইমাত্র মুখ মুছে রুমালটা পকেটে রাখলেন।]

করঞ্জাক্ষ—এক সপ্তাহ পরে আমরা আবার আজ এখানে মিলিত হয়েছি। কেবল কিরণবাবু আসতে পারেন নি। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। না, কারোর পালাবার পথ নেই। পুলিশ বাড়ির চারদিকে কড়া নজর রেখেছে। হ্যাঁ, আজই হত্যাকারী ধরা পড়বে; সে এই বাড়ির লোক এবং বাড়ির মধ্যেই আছে। তার আগে কয়েকটি কাজ সেরে নি।

[টেপ-রেকর্ড চালিয়ে দিল, হিরণের আবৃত্তি বেজে উঠল। সেটা থামিয়ে]

করঞ্জাক্ষ—জগদীশবাবু, এই কণ্ঠস্বরই কি আপনি সেদিন শুনেছিলেন?

জগদীশ—হ্যাঁ, ঠিক এই কণ্ঠস্বর।

করঞ্জাক্ষ—এটা কিন্তু হিরণবাবুর জীবন্ত কণ্ঠস্বর নয়। টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে আসছে। এবং আপনি সেদিন এই টেপ রেকর্ডেই তাঁর আবৃত্তি শুনেছিলেন। সুন্দর অ্যালিবাই। আচ্ছা হিরণবাবু, এবার আপনি বলুন এটা কিসের শব্দ।

[টেপ রেকর্ডে একটা শব্দ শোনা গেল—কে যেন পা টেনে টেনে চলছে]

হিরণবাবু—(অবাক হয়ে) বুঝতে পারছি না।

করঞ্জাক্ষ—বুঝতে ঠিকই পারছেন, স্বীকার করতে চাইছেন না।

হিরণ—আপনি জানেন আমি পঙ্গু হয়ে পড়ে আছি। উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারি না, হাঁটা তো অসম্ভব।

করঞ্জাক্ষ—উত্তেজিত হবেন না। আপনার ঘরে একদিন রাত্রে আমার লোক লুকিয়ে এই ছোট টেপ রেকর্ডারটি রেখে এসেছিল। এবং আপনি যে রাত্রে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তার প্রমাণ এ-ই আমায় দিয়েছে। আপনার প্লাস্টার-করা পা আমি এখনি ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাব।

হিরণ—(হেসে) বেশ, করাবেন। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্যটা কী ছিল সেটা জানতে পারি কি ?

করঞ্জাক্ষ—(হেসে) নিশ্চয়ই ! আপনি বদখেয়ালে প্রচুর টাকা নষ্ট করেছেন। আপনার দূর সম্পর্কের মামাবাবু তা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি উইল পরিবর্তন করে আপনাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আপনি সে কথা জানতে পেরে তার আগেই কাজ শেষ করে দিলেন।

হিরণ—তার কোন প্রমাণ আছে যে তিনি উইল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন ?

করঞ্জাক্ষ—প্রমাণ এই চিঠি (পকেট থেকে একটি চিঠি বার করে) এই চিঠি আমি তাঁর অ্যাটর্নির কাছ থেকে পেয়েছি। এতে তিনি উইল পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন।

হিরণ—কিন্তু আমি যে হত্যা করেছি তার কোন প্রমাণ আছে ?

করঞ্জাক্ষ—আছে। আপনাকে একজন ঘটনার দিন রাত্রি এগারটার সময় অর্থাৎ দেউড়িতে যখন দারোয়ান ঘণ্টা বাজাচ্ছিল তখন বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখেছেন। এত কাণ্ড না করলেও পারতেন। করেছিলেন, শুধু সম্পূর্ণ দোষটা কিরণবাবুর ওপর চাপাবার জন্যে।

হিরণ—কে, কে সেই শয়তান ? কে দেখেছে আমাকে ?

করঞ্জাক্ষ—(আঙুল দিয়ে) তিনি বাড়ির ক্যাশিয়ার মদনবাবু। আপনার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। এবং নিজ হাতে চিঠি লিখে সব কথা আমায় জানিয়েছেন।

হিরণ—ওকে আমি খুন করব!

[রাগে উত্তেজনায় পঙ্গু-চেয়ার থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় মদনবাবু? পুলিশের একজন ইনস্পেক্টর মদনবাবুর ছদ্মবেশে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতের রিভলভারের নলটা হিরণের দিকে লক্ষ্য করে উদ্যত]

করঞ্জাক্ষ—আমার কাজ শেষ হয়েছে। কোর্টে আবার দেখা হবে। নমস্কার।

—•—

●

বৈজ্ঞানিক—আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করব যাতে করে দেয়ালের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে।

সহকর্মী—আজ্ঞে সে আবিষ্কার তো আগেই হয়ে গেছে।

বৈজ্ঞানিক—হতেই পারে না! কী তার নাম শুনি?

সহকর্মী—আজ্ঞে জানলা।

●

ছবির প্রদর্শনীতে দর্শক—এ ছবিটা কেন টাঙিয়েছে বল তো?

বন্ধু—কী জানি! শিল্পীকে পায়নি বলেই হয়ত!





অবিস্মরণীয় সিংখুড়ো

বিমল দত্ত

সিংখুড়োকে সবাই ছেঁকে ধরল। একদিন সবাই, মানে তাঁর ভক্তবৃন্দ বিদ্যুৎ, ঘনা, নিতে, কাবলু, বাবলু, আলু, পুটু, ধোঁতা, গনশা ইত্যাদি।

'কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন? মানুষ চাঁদে পৌঁছল, চাঁদে ট্যাক্সি চলছে রাশিয়ার, আপনি কিছুই করতে পারলেন না? কী করছিলেন তাই বলুন—'

সিংখুড়ো চুপটি করে বসে মিটিমিটি রহস্যজনক হাসি হাসতে লাগলেন।

নিতে বললে, 'সিংখুড়ো আমাদের সিংকিং সিংকিং ড্রিংকিং ওয়াটার করছিলেন, বুঝলি না? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলেন আরকি।'

সিংখুড়ো তবুও চুপ। কেবল মিটমিট করে হাসতে থাকেন।

বিদ্যুৎ বললে, 'ওয়ান মে স্মাইল অ্যাণ্ড স্মাইল অ্যাণ্ড বী এ—'

হুঙ্কার দিয়ে সিংখুড়ো বললেন, খবর্দার! শেষ কথাটি বলেছ কি পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব! আমার সঙ্গে চালাকি, মস্করা?' তাঁর চোখদুটো জাহাজী সুপুরির মত ঠেলে বেরিয়ে জ্বলতে লাগল।

বিদ্যুৎ বললে, 'শেষ কথাটি হল হিরো—আপনি আমাদের হিরো, ওস্তাদ, যাকে বলে গুরু। আপনাকে নিয়ে কি আমরা মস্করা করতে পারি!'

সিংখুড়োর রাগ জল হয়ে গেল; মানে তিনি বিগলিত হলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে গল্প শুরু হয়ে গেল।

'জানি রে জানি, সেইজন্যেই তো এত আড্ডা থাকতে এই চুনোমাছের আড্ডায় আসি রে!'

বাবলু হেসে বললে, 'যা বলেছেন সিংখুড়ো, আপনার উপস্থিতি যেন চুনো মাছের ঝাঁকে রাঘব বোয়ালের ঘাই—চড়াইয়ের ঝাঁকে ঈগলের আবির্ভাব—'

সিংখুড়ো তাকে থামিয়ে বললেন, 'খুব হয়েছে, এবার একটু থাম দয়া করে!' বলে নাটকীয় ভঙ্গীতে হাতজোড় করলেন।

সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ল। বাবলু ঘাড় হেঁট করে বসল।

'একটা কথা তোদের বলা হয়নি—গেছিলাম সুন্দরবনে। একেবারে সুন্দরবনের মধ্যস্থলে। জায়গাটার নাম কালকাসুন্দিপুর। বাঘ সেখানে গিস্-গিস্ করছে, কুমির কিল্-কিল্ করছে, সাপ হিল্-হিল্ করছে। মশাগুলো চড়াই পাখির মত বড় বড়, জোঁকগুলো ঠিক মাগুর মাছের মত বড় বড়, আর ফড়িংগুলো, বললে বিশ্বাস করবি না, যেন ছোট ছোট টাট্টু ঘোড়া—'

বিদ্যুৎ দুষ্টুমি করে বললে, 'কয়েকটা আনলেন না কেন, চড়ে হাওয়া খেতে যেতাম!'

সিংখুড়ো যেন কিছুই বোঝেন নি এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন, 'কয়েকটা কী? বাঘ, কুমির না সাপ?'

সবাই বলে উঠল, 'ওরে বাবা! ও সব নয়—মানে, ঐ ফড়িং-এর কথা বলছিল বিদ্যুৎ!'

সিংখুড়ো বললেন, 'ও হাঁ, তা যা বলেছিস! কিন্তু ধরাই যায় না—ওদের আমরা নাম রেখেছিলাম ঘোড়ফড়িং। মশাদের নাম দিয়েছিলাম মশ-চড়াই আর জোঁকদের নাম দিয়েছিলাম 'জোঁগুর'……কাণ্ডকারখানা দেখে ভয়ে আমার মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছিল রে—'

বাবলু বললে, 'তবে আবার কালো হয়ে গেল কী করে?'

সিংখুড়ো বললেন, 'ঐ তো! গল্পের মাঝে প্রশ্ন তুললে গল্প এগুবে না তা আমি আগেই বলে রাখছি—হাঁ, যখন প্রশ্ন করেছিস শুনে রাখ, কালকাসুন্দিপুরে কেঁদো বাঘের তাড়া খেয়ে পড়েছিলাম কেলেনদীর জলে—সে জল কি-সব গাছের পাতা পচে একেবারে কাজল-কালি বর্ণের হয়ে গেছে—। তাতে ডুব দিয়ে মাথার শাদা চুল কালো হয়েছে আবার।'

ঘোঁতা বললে, 'ভারি মজার তো! ঐ জল শিশি ভরে তো চুলের কল্প বলে বিক্রি করা যায়!'

'তা যায়।' গম্ভীরভাবে বললেন সিংখুড়ো: 'তুই যা না এক সালতি শিশি নিয়ে!'

ঘোঁতা বললে, 'আমি? কিন্তু যদি বাঘে ধরে?'

সিংখুড়ো বললেন, 'তা তো ধরতে পারেই—বাঘেও ধরতে পারে কুমিরেও নেমন্তন্ন করে হিড়-হিড় করে জলে টেনে নিয়ে যেতে পারে—আবার—তাছাড়া মশচড়াই আছে, জোঁগুর আছে—।'

ঘোঁতাকে আশ্বাস দিয়ে বিদ্যুৎ বললে, 'যা না ঘোঁতা, ভয় কী? একটা ঘোড়ফড়িং কায়দা করে ধরে তার পিঠে চড়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটে পালাবি!'

টেউপে এতক্ষণ চুপটি করে একধারে বসে ছিল। এবার গা-ঝাড়া দিয়ে নড়ে-চড়ে বসল। তারপর প্রশ্ন করল, 'কিন্তু গেলেন কবে? কী উদ্দেশ্যে, আর কার সঙ্গেই বা গেলেন?'

সিংখুড়ো একটু মাথা চুলকে উত্তর দিতে লাগলেন, 'মনে আছে খিল্-খিলেন-পুরে ভূত শিকারের কথা? সেইখানে গিয়ে শুনেছিলাম কালকাসুন্দিপুরের গল্প। একজন জার্মান সাহেব তাঁর ভারত ভ্রমণে এই জঙ্গলের নানা তাজ্জব বিবরণ লিখেছিল—বাঘ-খেকে-রাক্ষুসে শামুকের গল্প আর মশচড়াইয়ের কথা—সাহেবের মশারির মধ্যে এক ঝাঁক মশচড়াই ঢুকে মশারি শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—আর…যাক, পরের কথা এখন যাক। খিলখিলেন পুরের জমিদারের নিমন্ত্রণে গতবছর পুজোর ছুটিতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে কালকাসুন্দিপুরে গেছিলাম। তাঁর বন্ধুদের নাম জগবন্ধু হালদার, নটবর বটব্যাল—আর হরিধন সারখেল।'

এই পর্যন্ত বলেই পকেট থেকে রুমাল বার করে সিংখুড়ো বার-বার চোখ মুছতে লাগলেন

ছেলেরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগল। বিদ্যুৎ অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে জিগগেস করল, 'কোন দুর্ঘটনা ঘটেছিল নাকি'

সিংখুড়ো কান্না থামিয়ে ধরা গলায় বললেন, 'দারুণ! নৌকা থেকে সারখেলকে রাতে কুমিরে টেনে নিয়ে গেল। তাকে আর পাওয়াই গেল

না। শুধু তার পায়ের একপাটি নাগরা জুতো নিয়ে আর তার এয়ার-ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলুম রে!' আবার ঘন-ঘন রুমাল ঘসতে লাগলেন চোখে।

'এর মধ্যে বটব্যাল পুরোনো লোক—এর আগে এ অঞ্চলে এসেছিল কাঠের ব্যবসা করতে। তার ডান পা-টা সরু—পায়ের ডিম নাকি এক-সঙ্গে তিন-চারটে জোঁকে লেগে খেয়ে ফেলেছিল। ফলে পায়ে তার জোর ছিল না। একটা মোটা লাঠিতে ভর করে হাঁটত। সে-ই আমাদের পথ-প্রদর্শক। আমরা সারখেলের অন্তর্ধান থেকে খুব সশঙ্কিত হয়ে টিন পিটে চললাম। কেলে নদীর জল মিশকালো—কুমিরের ছুঁচলো মুখ লুক-লুক করে লুভিয়ে উঠছে, আর দুধারের গাছে বসে মিশকালো দাঁড়কাক ডাকছে,—"কাও কাও, খাও খাও, গাও গাও, যাও যাও, ডাও ডাও……"

'হঠাৎ দাঁড়ী ও মাঝিরা সব এক যোগে রব তুলল "শামুক, শামুক, রাক্ষুসে শামুক"—তিন হাতটাক শুঁড় তুলে উলুঘাসের জঙ্গল দিয়ে সার বেঁধে চলেছে তারা…'ভয়ে, সত্যি কথা বলতে কী, কাপড় চোপড় ভিজে গেল—'

বিদ্যুৎ চমকে উঠে প্রশ্ন করল, 'ঘামে?'

সিংখুড়ো বললেন, 'আরে বাপু অত তখন কে ভাবে, আর ভাববার সময় বা কই—বন্দুকটা হাতে আছে, আর হাতটা থর-থর করে কাঁপছে। এমনি করে তো রাতে একটা ঘাঁটিতে পৌছোন গেল। ঘাঁটি মানে মাচা। দু-তিনটে গাছের মাঝে বাঁশ দিয়ে উঁচুতে বাঁধা একটা জায়গা। দড়ির মই বেয়ে উঠে বাঘ শিকার করবার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। ল্যাংড়া বটব্যাল কী ভীষণ গেছুড়ে—সে খোঁড়া পা নিয়ে তর তর করে উঠে গেল। আমি মোটা শরীর নিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে কোনক্রমে উঠলাম। দু-পকেট ভরে নিয়েছিলাম ভুট্টার খই, তাই আস্তে আস্তে চিবুতে লাগলাম।…সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—আকাশের সব ঝাঁপ ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে গেল। রাত ঝুম্‌-ঝুম্ করছে—বনের গাছে গাছে কেমন নিশ্‌পিশ্ শব্দ—চারদিক থেকে মশচড়াই উড়ে আসছে আর বোতলপাখির মত বিরাট পেঁচা ডাকছে—'তুই খুলি না মুই খুলি? ঝি দিবি না বৌ দিবি?' সবাই কুঁকড়ে তাল হয়ে বসে দুর্গানাম জপ করতে লাগলাম। হঠাৎ মাচার নিচে সপাং করে বেত মারার শব্দ হল—খড়-মড় করে শুকনো পাতার উপর কোন জন্তুর পায়ের শব্দ, মনে হল বাঘ

—মাটিতে লেজ আছড়াচ্ছে আর ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরছে—হঠাৎ একটা বোঁটকা গন্ধে যেন গা গুলিয়ে উঠল—নিশ্চয়ই বাঘ! বটব্যাল ফিসফিস করে বললে, 'বন্দুক রেডি করুন—রেঞ্জের মধ্যে এলেই ফ্ল্যাশ্ দেব—'

কয়েটি রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত—বটব্যাল ফ্লাশ-লাইট টিপল—দেখা-গেল সারা গায়ে ভুট্টার খই আটকে অপূর্ব মূর্তি ব্যাঘ্র মশাইয়ের। গুড়ুম গুড়ুম গুম্—তিনটি শব্দ—বাঘের হাঁক-ডাক, তারপর সব শেষ!'

ছেলের দল চেঁচিয়ে উঠল, 'থ্রি চিয়ার্স ফর সিংখুড়ো, হিপ্ হিপ্ হুরে!'

উপে বললে, 'সবই তো হল সিংখুড়ো, কিন্তু ভুট্টার খই এর ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

গণ্শা চেঁচিয়ে উঠল, 'তোর ঐ এক কথা—বুঝলাম না। বলি বোঝবার কী আছে এতে? এটা তো গল্প—ভুট্টা জানিস না? তার দানা থেকে খই হয়, শাদা শাদা, তা জানিস কি না বল!'

'তা তো জানি, কিন্তু বাঘের গা-ময় ভুট্টার খই লাগল কী করে?'

গণ্শা বললে, 'তাই তো! আচ্ছা সিংখুড়ো, এখানটা একটু খুলে বলুন তো!'

সিংখুড়ো হো হো করে হেসেই অস্থির। তারপর একটু সামলে শুরু করলেন, 'ও-সব আমার দেশী ফন্দি। আমি অন্ধকারে বাঘকে ঠিক-মত দেখতে পাব কি না ভেবে ভুট্টার খই সঙ্গে করে এনেছিলাম, আর এনেছিলাম এক শিশি দেশী গঁদ। রাত হতেই আমি গঁদে মাখিয়ে ভুট্টার খই ছড়ালাম মাচার নিচে—। বাঘ সেখানে মাটিতে গড়ালো, গা ময় লেগে গেল ভুট্টার খই—বটব্যাল যেই ফ্ল্যাশ-লাইট্ জ্বালালো অমনি শাদা ভুট্টার কুঁড়ুরিশোভিত বাঘকে দেখে বন্দুক ছুড়লাম। ব্যস্, কেল্লা ফতে! হা-হা-হা!'

বিল্টুং বললে, 'তারপর?'

'হ্যাঁ তারপর কী, সিংখুড়ো?' ছোট্ট আলু প্রশ্ন করল।

সিংখুড়ো বললেন, 'সে অনেক কাণ্ড,একদিনে কি শেষ হয়? যদি শুনতে চাস আর একদিন আসিস সব। *হালদারকে বিবরণ লিখতে বলেছি—তার সঙ্গে এনগেজমেন্ট আছে আজ, চলি।' উঠে দাঁড়ালেন সিংখুড়ো।

'বটব্যালবাবু কোথায় থাকেন, সিংখুড়ো?' উপে জিজ্ঞাসা করল।

সিংখুড়ো বললেন, 'কেন কালকাসুন্দিপুরেই। সে আজকাল আর লাঠি নিয়ে হাঁটে না। ঘোড়ফড়িং চড়তে শিখেছে। রোজ সকালে কেলে নদীর ধারে ঘোড়ফড়িং চড়ে বেড়াতে যায়।' সিংখুড়ো প্রায় তখন দরজার কাছে এসে গেছেন।

ঘোঁতা বললে, 'এসব কি সত্যি সিংখুড়ো?'

সিংখুড়ো অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাঁটি বলে এই ভেজাল দুনিয়ায় যদি কিছু থাকে তো তা আমার গল্প, বুঝেছিস!' বলে একটু জোর হেঁটে একটা সাইকেল রিক্সায় চড়ে বললেন, 'চল!' পঁক্-পঁক্ করে হর্ন দিয়ে সাইকেল-রিক্সা মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

বল তো?

১। বাদুড়রা কি অন্ধ? ২। হাতিরা কি ইঁদুরকে ভয় করে? ৩। কোন পাখিরই কি দাঁত নেই? ৪। বেড়াল কি অন্ধকারে দেখতে পায়? ৫। যে খেতে দেয় কুকুর কি তাকে বেশি ভালবাসে? ৬। খ্রীষ্টপূর্ব ২০শ সালের ১লা জানুয়ারি একজনের জন্ম হয়েছিল। সে মারা যায় খ্রীষ্টীয় ২০শ সালের ১লা জানুয়ারি। মৃত্যুকালে তার কত বয়স হয়েছিল? । ঢং ঢং করে ছটা বাজতে যদি ঘড়ির পাঁচ সেকেণ্ড সময় লাগে, তাহলে বারোটা বাজতে কত সময় লাগবে? ৮। কোন্ দেশ তা-ই খান?

[উত্তর ৩২ পৃষ্ঠায়]



খেলাধুলো

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের অবসান হল। খেলাধুলোর জগতে এ বছরটা অনেক দিক দিয়েই স্মরণীয়। বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রেজিলের জয়লাভের খবর তোমরা সকলেই জান, তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত খেলোয়াড় পেলে তো আজ প্রায় রূপকথার রাজকুমার! তারপর বলতে হয় আন্তর্জাতিক টেনিস ডেভিস কাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের অভাবনীয় সাফল্য এবং তার পরের রাউণ্ডেই পশ্চিম জার্মানির কাছে পরাজয়ের কথা। কমনওয়েল্থ্ গেম্‌সে ভারতের সাফল্যে নিশ্চয় তোমাদের বুক ফুলে উঠেছে,—বিশেষ করে কিশোর বেদপ্রকাশের অপূর্ব নৈপুণ্য নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করেছে,—কারণ কতই বা বয়স তার, তোমাদেরই মত, কিংবা হয়ত দু-এক বছর বেশি। এশিয়ান গেম্‌সের ফলাফলও তোমরা কাগজে দেখেছ,—দেখেছ কেন, ইতিমধ্যেই তা তোমাদের কাছে পুরোনো হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচের ফলাফলগুলিও নিশ্চয় তোমরা লক্ষ্য করে চলেছ। কী মনে হয়, ইংল্যাণ্ডের মুখে ছাই দিয়ে অস্ট্রেলিয়া কি 'ছাই' জিতে নেবে?

এবার একটু দেশের দিকে ফেরা যাক। জাতীয় ব্যাডমিন্টনে বাংলার ছেলে দীপু ঘোষের সাফল্যে নিশ্চয় উল্লসিত হয়েছ,—ডবল্‌সেও দীপু তাঁর ভাই রমেনের জুটিতে খেলে বিজয়ী হয়েছেন। তারপর ক্রিকেটে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের অবশিষ্ট দলের সঙ্গে গত বছরের বিজয়ী বোম্বে দলের ইরানী ট্রোফির খেলা, তার খবরও তোমাদের জানা। এবং যারা কলকাতায় বা কলকাতার কাছাকাছি থাক তাদের অনেকে হয়ত সে খেলা দেখেও থাকবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় টেবল টেনিস খেলা এইমাত্র শেষ হল—এই তো মাত্র পরশু জাতীয় প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা দেখে এলাম, আর কাল দেখে এলাম জাপানের সঙ্গে ভারতের টেস্ট খেলা। জাপানের সঙ্গে ভারত পারবে কী করে,—জাপান যেখানে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন, সেখানে ভারতের

স্থান অনেক নিচে। তাহলেও জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জগন্নাথ খুবই ভাল খেলেছেন,—তিনি জাপানের তিন নম্বর খেলোয়াড় কোনো-র কাছ থেকে একটা গেম নিয়েছেন, যদিও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেন নি, ২—১ গেমে হেরে গেছেন। উদীয়মান খেলোয়াড় দিল্লীর দীপক ওয়াদেরাও বেশ ভাল খেলেছে—বয়সে যে তোমাদের থেকে বিশেষ বড় হবে না। কিন্তু আমরা গত দু-বছরের চ্যাম্পিয়ান মীরকাশিম আলির কাছ থেকে আর-একটু ভাল খেলা আশা করেছিলাম। আগের দিনে ফাইন্যালেও তিনি জগন্নাথের সঙ্গে ভাল খেলেন নি। দেখা যাক আরও যে পাঁচটা টেস্ট খেলা হবে তাতে ভারত কী করে।

জাতীয় টেবল টেনিসের আন্তঃরাজ্য খেলার মোটামুটি ফলাফল জানাচ্ছি।

পুরুষ—(১) মহারাষ্ট্র, (২) অন্ধ্র, (৩) দিল্লী।

মহিলা—(১) মহারাষ্ট্র 'এ', (২) বাংলা, (৩) মহারাষ্ট্র 'বি'।

বালক—(১) মাদ্রাজ, (২) মহারাষ্ট্র, (৩) অন্ধ্রপ্রদেশ, (৪) মহীশূর।

এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পরবর্তী সংখ্যায় জানাব।

খেলা শেখা নিয়েও একটা ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে চেষ্টাও চলছে। বল, কোন্ খেলা সম্বন্ধে আগে জানতে চাও। তোমাদের ভোটেই এটা ঠিক হবে।

বল তো'র উত্তর

১। না। তবে তাদের চোখ খুব ছোট-ছোট, আর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। ২। না। মানুষ ছাড়া কোন প্রাণীকেই হাতি ভয় করে না। ৩। না। ৪। না। অন্তত সামান্য একটু আলোর রেখা দরকার। ৫। না। অনেক কুকুর তার মনিবকেই ভালবাসে, যদিও তাকে খেতে দেয় অন্য লোক। ৬। উনচল্লিশ বছর। কারণ 'শূন্য' বলে কোন সাল ছিল না, যেজন্যে মৃত্যুকালে তার বয়স চল্লিশ হবে না। ৭। এগারো সেকেণ্ড, কারণ দুটো ঘণ্টার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক সেকেণ্ড। ৮। জাপান (যা পান)।